২৬-০৪-১৮ : প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের কর্তব্য হলো অবিনাশী জ্ঞান-রত্নের অর্জন করা আর অন্যদেরকেও উৎসাহিত করিয়ে তার লাভ পাইয়ে দেওয়া। দান করতে কারও অনুমতি নিয়ে হয় না-বরং তা করে দেখাতে হয়।

প্রশ্ন :- বাবার হৃদয়ে সদা কি এমন শুভ ভাবনার আশা থাকে ? কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে বাবা তোমাদেরকে ওঁনার নিজের মতন করে গড়ে তুলতে চান ?

উত্তর :- বাবার হৃদয়ে সর্বদাই এই ভাব থাকে যে, কিভাবে বাচ্চাদেরকে খুব সুখে রাখা যায়। অসীম বেহদের বাবার কখনই, বিকল্প বা কোনও খারাপ কার্য করার, কিম্বা কোনও প্রকারের দুঃখ দেবার সংকল্প আসে না। যেহেতু এই বাবা যে কেবলই সুখদাতা। বাবাও তেমনি আশা রাখেন, তার বাচ্চারাও যেন এ বিষয়ে বাবার মতনই হয়। তাই বাবা বলছেন- মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা নিজেদেরকে চেক্ করো, তোমরা কি সর্বদা শুদ্ধ সংকল্পের মধ্যেই থাকো ? বিকল্প-খারাপ কিছু আসে না তো মনে ?

গীত :- ওহে প্রাণী- নিজের মন-দর্পণে সদা নিজেকে বিচার করে দেখ্

ওঁম্ শান্তি! ভগবান উবাচঃ - এ কথা কে বললেন, ওহে প্রাণী নিজের মন-দর্পণে নিজেকে সদা বিচার করে দেখ ? --প্রাণী বলা হয় জীব আত্মাকে। এই জীব আত্মারাই পরমাত্মা বাবার বাচ্চা। আবার বাচ্চারা নিজেরাও তা জানে, প্রকৃত অর্থে তারা আত্মা। এখানে এখন রয়েছেন, তোমরা আত্মাধারীদের প্রকৃত বাবা পরমপিতা পরমাত্মা। জীব অর্থাৎ শরীর, আর এই শরীরধারী বাবার নাম প্রজাপিতা ব্রহ্মা। বাস্তবে তোমরা সবাই বাপদাদার সন্তান-সন্ততি। বাবা স্বয়ং বসে জীব আত্মাদেরকে বুঝিয়ে বলছেন- ওহে বাচ্চারা, তোমরা নিজেরা নিজেদের মন-দর্পণে উঁকি দিয়ে দেখো, কত শতাংশ পুণ্য আত্মা হতে পেরেছো তোমরা ? কত দান-ধ্যান, পুণ্য-কর্ম করছো তোমরা ? মানুষেরা এসব কথার প্রকৃত অর্থটাই তো বুঝতে পারে না। প্রকৃত দান-পুণ্য হয় অবিনাশী জ্ঞান-রত্নের দানেই। এখন নিশ্চয় তোমাদের বুদ্ধিতে এসেছে যে, তোমাদের এই বাবা একদিকে যেমন বাবা, অপরদিকে শিক্ষক, তেমনি আবার গুরুও বটে। অর্থাৎ অসীম বেহদের এই বাবা সবকিছুই। এই বোধ এলেই তোমাদের দেহ-অভিমান ভাব দূর হয়। সেই অসীম বেহদের বাবাকেই তোমরা স্মরণ করে আসছো, গত অর্দ্ধ-কল্প ধরে। যা ভক্তি-মার্গ থেকে শুরু হয়। ভক্তরাই ভগবানকে স্মরণ করে। যেহেতু তারা জানে, ভগবান এক ও অভিন্ন-যিনি নিরাকার, অর্থাৎ আত্মাদের পিতা। সাকার বাবা তো জন্ক-জানোয়ারের, সবারই থাকে। কিন্তু তোমাদের এই বাবা পরমধাম নিবাসী, আত্মাদের প্রকৃত বাবা। যিনি তোমাদেরকে সত্য পথের পথিক বানান। কেবলমাত্র পুণ্য আত্মারাই সেই সত্য-খণ্ডে (স্বর্গে) বসবাসের উপযুক্ত। তোমাদের মধ্যেও এই ধারণা হয়েছে এখন। তোমরা যত এই সত্য-বাবার সান্নিধ্যে থাকতে পারবে, ততই বাবার তৈরী সেই সত্য-খণ্ডের উচ্চ-পদের অধিকারী হতে পারবে। আর এ নিয়েই তোমাদের নিজেদের মধ্যে চলে প্রতিযোগিতা। জাগতিক লেখাপড়ায় যেমন কেউ ব্যারিস্টার হয়, কেউ বা হয় ইঞ্জিনিয়র, কেউ বা অল্প-বুদ্ধির আবার কেউ বা তীক্ষ্ণ-বুদ্ধির, কারও উপার্জন লাখ টাকা, আবার কারও হয়ত অনেক চেষ্টায় ৫০০ টাকা রোজগার হয় - আর এসব কিছুরই প্রাপ্তি হয় তাদের পঠন-পাঠনের ডিগ্রীর উপরেই।

এখানে তোমরা বাচ্চারা, এই অবিনাশী জ্ঞান-রত্নের ভাণ্ডার থেকে তোমাদের যেমন খুশী তেমনি জ্ঞান-রত্নে নিজেদেরকে ভরপুর করে নিতে পারো। যেগুলি তোমাদের প্রকৃত কাজে আসবে। এই জ্ঞান-রত্নের ধারণা ধারণ করতে পারলেই পুণ্য আত্মা হওয়া যায়। আর অন্যদেরকেও দান করে তাদেরকেও পুণ্য আত্মা বানাতে হবে। নিজেই নিজের কাছে প্রশ্ন করে জেনে নিতে হবে, নিজে তা কতটা ধারণ করে কতটা পুণ্য আত্মা হতে পেরেছি। আর পুণ্য না কামাতে পারলে তো পাপাত্মাই থেকে যেতে হবে। এই ভাবেই নিজের মন-দর্পণে নিজেকে দেখতে হবে। পিছনের দিকে বসা ছাত্রদের শিক্ষক যেমন বোঝে, বাবাও তেমনি তোমাদের সবাইকে বুঝতে পারেন। বাচ্চাদের রেজিস্টার দেখলেই সবকিছু বোঝা যায়। এসব ঘটে জাগতিক স্কুলে। বাচ্চারা, তোমাদেরটা কিন্তু গুপ্তই থাকে। তাই মাম্মা-বাবা লাগাতার তোমাদেরকে সেই ধারণায় উদ্বুদ্ধ করাতেই ব্যস্ত থাকেন। অতএব বাচ্চারা, অবিনাশী এই জ্ঞান-রত্নকে নিজেরা ধারণ করে, অন্যদেরকেও তা ধারণ করাও। আর নিজেরাই যদি পুণ্য আত্মা হতে না পারো, তবে অন্যদের পুণ্য আত্মা বানাবে কি প্রকারে ? এটা কোনও সাধারণ জাগতিক বিষয় নয় মোটেই, এ হলো ঈশ্বরীয় ব্যাপার। যে যত এই জ্ঞান-রত্নে ধনী হয়, তার খুশীর পারদও ততই উঠতে থাকে। বিনাশী ধন-সম্পদ তো অনেক মানুষের কাছে প্রচুর পরিমানেও থাকে। খবরের কাগজেও তার বিজ্ঞাপন দিয়ে জানায়, অমুক ব্যাক্তি বর্তমানে সব চাইতে ধনী ব্যাক্তি। এতেও কিন্তু ক্রমিক নম্বর হয়। কিন্তু বাচ্চারা, তোমাদের তো সেই বিনাশী ধন-সম্পদের ব্যাপার নয়। তোমাদের ব্যাপার হলো অবিনাশী জ্ঞান-রত্ন অর্জণ করা আর অন্যদেরও তাতে উদ্বুদ্ধ করানো। যার জন্য কারও কোনও অনুমতির প্রয়োজন নেই। দান করতে চাইলে কারও অনুমতি নেবার প্রয়োজন পড়ে না। তা করে দেখাতে হয়।

বাবা আবার বাচ্চাদেরকে বলছেন- বাচ্চারা, তোমরা নিজেরা নিজেদের মন-দর্পণে নিজেকে দেখো, নিজে কতটা পুণ্য আত্মা হতে পেরেছো। পূর্বে তোমরা সবাই নম্বর ওয়ান পাপ আত্মা ছিলে। আবার (অনেক পূর্বে) যখন তোমরা পুণ্য আত্মা ছিলে, তখনও নম্বর ওয়ান ছিলে। এখন আবার তা হতে চলেছো, যেহেতু এখন তোমরা জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন পেয়েছো। ফলে ধীরে ধীরে পুণ্য আত্মায় পরিণত হচ্ছো। এখন যেমন যেমন এই জ্ঞান-রত্নের ধন একত্রিত করতে থাকবে- ততই ধনী হতে থাকবে। জাগতিক এই বিনাশী ধন-সম্পদের মধ্যে থাকলে আগামীতে ভিখারীই হতে হবে কিন্তু এই অবিনাশী জ্ঞান-রত্নের দ্বারাই তোমরা প্রকৃত ধনী হতে পারবে। তাই যার যা কিছুই আছে, তার অদল-বদল করে নাও। তোমাদের তন-মন-ধন যা কিছু আছে, সবকিছুই বাবাকে নিবেদন করে দাও, বদলে বাবা তোমাদেরকে জ্ঞান-রত্নের অলংকারে সাজিয়ে দেবেন। অর্থাৎ তন-মন-ধন, সবকিছুই নতুন রূপে পাবে। সেখানে (স্বর্গে) মায়াও থাকে না, তাই তোমাদের মনও বিভ্রান্ত হয় না। এখানে এখন তোমাদের মন মায়ার বশে। এই মনই মানুষকে খুব হয়রান করে। যোগ-যুক্ত না হতে পারলে, মন শয়তানে পরিণত হয়। এখন এটাই দেখার, বাবার থেকে তোমরা কত জ্ঞান-রত্নের ধন-সম্পদ নিতে পারো, আর তা কতই বা দান করতে পারো। মাম্মা-বাবাও তোমাদেরই মতন মনুষ্যই ছিলেন। ওনারাও কান দিয়েই শুনতেন। নিরাকার বাবা এনার অর্থাৎ ব্রহ্মার এই মুখ-ইন্দ্রিয় দিয়েই কথা বলেন। সব নিরাকার আত্মাদেরই তাদের নিজ নিজ শরীর আছে। বর্তমানের এই পুরোনো কলিযুগে মানুষেরও পুরোনো শরীরে কেবলই রোগ-ভোগ আর দুঃখ-কষ্ট লেগেই থাকে। বাচ্চারা এও জানো, একমাত্র এই বাবা এসে বাচ্চাদেরকে সদা কালের সুখী বানায়। তাই বাবাকে পেয়ে বাচ্চাদের অন্তরে খুশীর তালি বাজতে থাকে। যার প্রকাশ বাইরেও দেখা যায়। তেমনি সংকল্পের তালিও প্রথমে

অন্তরের ভিতরে বাজতে থাকে, পরে তা বাইরেও বাজতে থাকে। প্রথমে মনের ভিতরে ভাব আসে এটা করবো, তারপরেই তো কর্ম-ইন্দ্রিয় দ্বারা তা করা হয়। সুতরাং যখন তা আসে, তখনই তাকে পরীক্ষা করে নেওয়া উচিত, আমার মনে যে সংকল্প এসেছে, তা কি শুদ্ধ সংকল্প না কি বিকল্প বা অশুদ্ধ সংকল্প ? শুদ্ধ সংকল্প মানে শুদ্ধ ভাবনা আর বিকল্প সংকল্প অর্থাৎ অশুদ্ধ ভাবনা। অসীম বেহদের বাবা কখনই কোনও বিকল্প সংকল্প করেন না। যেহেতু উনি তো কেবলই সুখদাতা। কিন্তু তোমাদের আসতে পারে বিকল্প সংকল্প - কাকে কিভাবে দুঃখ-কষ্ট দেওয়া যায়, কিম্বা বিকর্ম কর্ম করার। অথচ বাবা তো তোমাদের হুবহু বাবার মতন করেই গড়ে তোলার জন্য এখানে এসেছেন। এছাড়া একথা তো সবাই জানে, সব বাবাই সর্বদা বাচ্চাকে মনের মতন করে গড়ে তুলতে চায়। দুঃখ-কষ্ট দেবার জন্য বাচ্চার জন্ম দেয় না মোটেই। দুঃখ-কষ্টের ভোগ তো হয় তাদের নিজ নিজ কর্মের ফল অনুসারে। মা-বাবার ইচ্ছা থাকে বাচ্চাকে খুব সুখে রাখবে, কিন্তু সেখানেও মায়া প্রবেশ করে। যেমন লৌকিক বাবা ভাবল, বাচ্চাকে বিয়ে করালে বাচ্চা হয়ত খুব সুখ-শান্তিতে থাকবে। এ বিষয়ে পারলৌকিক বাবা বলেন- "বিয়ে করলে তো এক্কেবারেই সর্বনাশ হয়ে গেল তোমার। বরঞ্চ আমি তোমাদের এমন সুন্দর ফুলের মতন বানিয়ে দেবো, স্বর্গ-রাজ্যে গিয়ে যখন তোমার বিয়ে হবে, সেখানে তুমি মহারাজা-মহারাণী হবে, খুশীর দোলনায় দুলতে থাকবে। এবার বোঝো, লৌকিক বাবা আর পারলৌকিক বাবার বুদ্ধির মধ্যে তফাৎ কতখানি।

বর্তমান সময়ে মানুষদের মধ্যে রয়েছে মায়ার খুব কড়া সংস্কার। যেমনটা ছিল মহাপাপী অজামিলের। বাবা তো চান, বাচ্চাদের এমন সুখী বানাতে, যাতে তারা সর্বদাই খুশীর দোলায় দুলতে পারে। অসীম বেহদের এই বাবার হৃদয়ে বাচ্চাদের অনেক সুখের জন্য কত সুন্দর সুন্দর ভাবনা ও ইচ্ছা থাকে। জাগতিক মা-বাবা যখন সন্তানের জন্ম দেন, তখন তো মা-বাবাকেই সে দ্বায়িত্ব পালন করতে হয়, সন্তানকে কিভাবে সুখে রাখা যায়। তেমনি এই বেহদের বাবাও চান, ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানেরা কিভাবে সুখী হতে পারে। যদিও লৌকিক মা-বাবা আর পারলৌকিক বাবার বুদ্ধির মধ্যে বিস্তর তফাৎ। তাই তো বেহদের বাবা বলছেন, একমাত্র ওনার সাথেই বুদ্ধির যোগ লাগিয়ে রেখে আর বাকী যারা আছে, অর্থাৎ মা-বাবা, মিত্র-সম্বন্ধী ইত্যাদি ইত্যাদি যারা আছে, তাদেরকে মন থেকে দূরে সরিয়ে রেখে, একমাত্র এই পারলৌকিক বাবাকেই স্মরণ করতে। যেহেতু একমাত্র এই বাবাই যে তোমাদের সবকিছু। যদিও মায়া তোমাদের প্রতিকক্ষণই দুঃখ-কষ্ট দিতে চেষ্টা করে যাবে, কিন্তু এই বাবাই তোমাদেরকে সুখের সাগর বানাবে। বাবা নিজে কোনও রাজ্য-ভাগ্যের রাজ্য সুখ ভোগ করেন না। তিনি ওনার বাচ্চাদেরকেই তা বানান। তাই তো এমন বাবাকে বলা হয় সুখের-সাগর, শান্তির-সাগর। যেহেতু একমাত্র উনি-ই তোমাদেরকে খুব সুখী বানিয়ে থাকেন। কত সুন্দর রীতিতে এসব বুঝিয়ে দেন এই বাবা। এত সুন্দর সহজ-সরল পদ্ধতিতে আর কেউ-ই তা বোঝাতে পারেন না। ভারতে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে - "ত্বমেব মাতা চঃ পিতা ত্বমেব", কিন্তু বাবার এই মহিমা এল কোত্থেকে, যা লোকেরা গায়ন করে থাকে ? বাবা স্বয়ং তা জানিয়ে দিচ্ছেন, এই পারলৌকিক বাবার দ্বারাই তোমরা সর্ব-প্রকারের সুখ পেয়ে থাকো। আর এই কারণেই তোমাদের বলা হয়, অন্যসব সঙ্গ ছেড়ে দিয়ে এই এক বাবার সাথেই বুদ্ধির যোগ লাগাও। তোমাদের মিত্র-সম্বন্ধী যা কিছুই আছে, সবকিছুই ভুলে যাও-এমন কি নিজের দেহের ভাবকেও ভুলে থেকে নিজেকে দেহী-অভিমানী ভাবো।

বাবা ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদেরকে ফুলের মতন করে গড়ে তোলেন। তাই তো বলেন- বাচ্চারা, তোমরা কেবল আমার কথাই শুনবে। একমাত্র আমার সাথেই যোগ-যুক্ত হও। আমি যেমন জ্ঞানের-

সাগর, সমগ্র মনুষ্য সৃষ্টি-জগতের রচনাকেও জানি, তেমনি তোমাদের বুদ্ধিতেও এই সৃষ্টি-জগতের চক্র যেন ঘুরতে থাকে। জাগতিক মাতা-পিতারাও কখনই তাদের বাচ্চাকে কোনও প্রকারের দুঃখ-কষ্ট দেন না। দুঃখ দেবার উদ্দেশ্যে এত কষ্ট করে এমন সুন্দর রচনা নিশ্চয় রচেন না। তাই ঈশ্বরীয় বাবা বলছেন- যা হবার তা তো হয়েই গেছে। কিন্তু এই অবিনাশী ড্রামা অনুসারে এখন তোমরা পবিত্র ফুলের মতন হয়ে ওঠো। স্বর্গ-রাজ্যে কোনও প্রকার বিকারধারীর স্থান নেই। তোমরাই তো সেখানকার মহারাজা-মহারাণী হও। পুরো দুনিয়াও তা জানে। সত্যযুগ হলো স্বর্গ-রাজ্য অর্থাৎ সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া। স্বর্গের দেব-দেবীদেরকে তাই সবাই পূজো করে, যেহেতু তারা সম্পূর্ণ পবিত্র আর সর্বগুণ সম্পন্ন হয়। কালচক্রে তারাই আবার ১৬-কলা থেকে কলাহীন হয়ে পড়ে। ঠিক যেমন চন্দ্রের কলা হ্রাস পেতে থাকে ধীরে ধীরে। যা পরে অন্ধকারময় হয়ে ওঠে, যাকে অমাবস্যা বলা হয়। কলার ব্যাপারটাও ঠিক তেমনই। মনুষ্যের মধ্যে তখন আর কোনও গুণ অবশিষ্ট থাকে না, র্নিগুণে পরিণত হয়। ১৬-কলা কেন, এক কলাও অবশিষ্ঠ থাকে না। আর যখন সেই এক কলাও অবশিষ্ট থাকে না, তাকেই ঘোর অন্ধকার বলা হয়। আবার যখন সেই গুণ ও শক্তিগুলি সঞ্চয় করতে পারলে, ধীরে ধীরে কলা বাড়তে থাকে। যা পুরো হলে ১৬-কলায় পূর্ণ হয়। বর্তমানে তোমরা এখন কলাহীন হয়ে, জৌলুস হারিয়ে কালো-কদর্য হয়ে আছো। তাই তাকে ব্রহ্মার অন্ধকার রাত্রি বলা হয়। এই ব্রহ্মাকেই প্রজাপিতা বলা হয়। আর বি.কে.-দের বলা হয় ব্রহ্মাকুমার ও ব্রহ্মাকুমারী। পূর্বে বি.কে.-দেরও ঘোর অন্ধকারের রাত ছিল, এখন তা আলোর দিশায়। আবার তোমরা ১৬-কলায় পূর্ণ হতে চলেছো। সূর্যবংশীদেরই ১৬-কলা সম্পূর্ণ থাকে। যা ক্রমে ক্রমে হ্রাস হতে থাকে। তোমরা বি.কে.-রা সবাই আবার সেই ১৬-কলা সম্পন্ন হবার জন্য জ্ঞান-গুণ-শক্তিগুলি ধারণ করো। এখনই তা এমন ভাবে ধারণ করতে হবে, সত্যযুগ আসার পূর্বেই তা যেন ১৬-কলায় সম্পূর্ণ হয়ে যায়। রাজা-রাণী হতে গেলে ১৬-কলা সম্পূর্ণ লাকী স্টার যে হতেই হবে। স্বর্গ-রাজ্যে যেমন সুখভোগ রাজা-রাণীর তেমনই প্রজাদেরও। অবশ্য সবার মধ্যেই ক্রমিক নম্বর অনুসারেই তার প্রাধান্য হয়। সেই রাজারাই এখন ভিখারী হয়ে গেছে। এখন তারাই আবার ভিখারী থেকে রাজায় পরিণত হতে চলেছে।

বাবা এখন বলছেন- বাচ্চারা, সবকিছু ভুলে গিয়ে এখন অশরীরী ভাবে থাকো। নিজেকে দেহী অর্থাৎ আত্মা ভেবে মিত্র-সম্বন্ধী ইত্যাদি যা কিছু আছে সবকিছুকেই ভুলে যাও। তোমার বলতে যা কিছু (বিনাশী) আছে, সবকিছুই সমর্পণ করে দাও। তার বদলে বাবা দিচ্ছেন অবিনাশী জ্ঞান-রত্নের ভাণ্ডার। এই রত্ন এতই অমূল্য, এর এক একটির মূল্য কেউ-ই নির্দ্ধারণ করতে পারে না। ইতিপূর্বে রূপ-বসন্তের কাহিনী তো বাবা তোমাদের শুনিয়েছেন। যাদের মুখ থেকে অনর্গল জ্ঞান-রত্নই বেরোতো। যা পরে ভক্তি-মার্গের শাস্ত্রগুলিতে লিপিবদ্ধ করেছে শাস্ত্রকারেরা। সদগতি করতে পারেন কেবলমাত্র এই এক ও একমাত্র বাবা। আর এই জ্ঞানের মাধ্যমেই তা সম্ভব। তাই তো এই জ্ঞানকে বলা হয় "জ্ঞান-অমৃত"! যাকে আবার "মান সরোবর"-(যেখানে ডুব দিলে ফরিস্তার মতো হল্কা ও পবিত্র হয়ে যায়) -ও বলা হয়, আবার অমৃত-ও বলা হয়। যার স্মৃতিতে জাগতির রীতিতে অমৃতের জল পান করানো হয়। তথাকথিত জাগতিক ব্রাহ্মণেরা ঘটিতে জল ভরে তাকেই অমৃত বলে পান করায়। অথচ, বাস্তবে জ্ঞান অর্থাৎ নলেজ। তাই বাবা বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলছেন- ওহে আমার আদরের বাচ্চারা, এবার তোমরা দেহী-অভিমানী ভাবে এসো। এছাড়া মায়া তোমাদেরকে ছাড়বে না। একদিকে তোমরা দেহী-অভিমানী হবার চেষ্টা করবে, অপরদিকে মায়া দেহ-অভিমানী বানাতে চেষ্টা করবে। এটাই তোমাদের সবচেয়ে কঠিন যুদ্ধ-লড়াই। মায়া দেহ-অভিমানী বানাতে পারলেই ধাক্কা দিয়ে একেবারে গভীর খাদে ফেলে দেয়। কিন্তু দেহী-অভিমানী হয়ে থাকতে পারলে তার থেকে

রেহাই। অতএব নিজ বুদ্ধি অনুসারে কাজ করবে। বাবা তো সর্বদাই বলতে থাকেন, খুব মনোযোগ সহকারে পঠন-পাঠন করো, তাতে শিক্ষকেরও নাম-যশ হবে। ইনিই একমাত্র বাবা যিনি এজন্য পুরস্কৃতও করেন সেই বাচ্চাদেরকে, যারা খুব মনোযোগ সহকারে পড়ে এবং অন্যদেরকেও পড়ায়। তাদেরকেই বাবা সাথে সাথে বাহ্ বাহ্ বলেন। আর তোমরা যদি উচ্চ পদের অধিকারী হতে চাও তো, সর্বাগ্রে মন-দর্পণে নিজেদরকে দেখবে- বাবার প্রতি তোমার কতটা ভালবাসা আছে ? কত পরিমাণে দেহী-অভিমানী আর কতটা দেহ-অভিমানী হতে পেরেছো ? রোজ দিন ও রাতে কতটা পরিমানে পুরুষার্থ করছো ? যখন এই দেহ অভিমান আসে, তখনই স্মরণের যাত্রাকে মাঝপথে থামিয়ে দেয় মায়া। ফলে বাচ্চারা তখন বাবাকেই স্মরণ করতে ভুলে যায়, উপরন্তু দু-পা এগিয়ে তিন-পা পিছিয়ে যায়। একদিকে কিছুটা লাভ হলে, অপরদিকে আবার ভারী লোকসান হয়ে যায়। লাগাতার দেহী-অভিমানী হয়ে থাকতে পারলে পুণ্যের খাতাও ভরে যেত এতদিনে। এই মায়াই যেখানে-সেখানে লোকসান করিয়ে দেয়। কিন্তু, দ্বায়িত্ববোধ সম্পন্ন বাচ্চারা সেই পুণ্যের খাতার প্রতি সজাগ থাকে। তা না হতে পারলে মায়া তাদেরকে দেউলিয়া করে ছাড়ে। এটা এমনই এক বিশেষ ধরণের লাভ-ক্ষতির ব্যাবসাও বটে। যা জমা হবার তাও জমা হয় না, উল্টে পূর্বের জমা থেকেও কম হয়ে যায়। মায়াই তোমাদের এসব ভুলিয়ে দেয়। সেটাই তোমাদের চেক্ করতে হবে, কতটা বাবাকে স্মরণ করছো, আর কতজনকে তোমার মতন করে গড়ে তুলছো ? যে ভাল ব্যাবসায়ী হয়, সে সবকিছুরই হিসেব-নিকেশ করে মিলিয়ে দেখে। তা না করলে, সে তো অনভিজ্ঞ-আনাড়ী ব্যাবসায়ীই হবে। কোনও কোনও বাচ্চা বাবাকে খুবই সুখ দেন, যেমন কেউ হয়ত লিখে জানালো- বাবা, অমুক বি.কে. আমাকে এমনই তীর লাগিয়েছে যে, পাপ আত্মা থেকে আমি এখন পুণ্য আত্মায় পরিণত হয়েছি। সেই সব নতুন বাচ্চারা, বাবার সাথে সাথে সেই বি.কে.-র প্রতিও সমর্পিত হয়ে যায়।

বাচ্চারা, তোমাদের নিজের ও গৃহস্থ পরিবারের শরীর নির্বাহের জন্য কর্ম-কর্তব্যও তো করতে হবে। আবার ঘর-গৃহস্থালীতে থেকেও বাবার সাথে পুণ্য অর্জণের ব্যাবসাও করতে হবে। যোগবলের দ্বারা নিজের পুরোনো পাপকে ভষ্মও করতে হবে এবং অন্যদেরকেও পুণ্য আত্মা বানাতে হবে। এসবকিছুই কিন্তু করতে হবে, বুদ্ধিযোগের সাহায্যে। আর বুদ্ধি উন্নত হয় তখনই, যদি বাবার স্মরণে থাকতে পারো। আর তা না হলে তো দেহ-অভিমানে এসে মিত্র-সম্বন্ধীদেরকেই স্মরণে আসবে। মায়া এমনই নাছোড়বান্দা, কিছুতেই যেন ছাড়তে চায় না। অনেকে আবার এমনও আছে, শিববাবার এই শ্রীমৎ অনুসারে চলতে চলতে, হঠাৎই সেই শ্রীমৎ-কেই লাথি মেরে দূরে সরিয়ে দেয়, ফলে আগামীতে তারা পদ-ভ্রষ্টও হয়ে যায়। অবশ্য অন্তিমে তাদেরকে অনুতাপ করতে হবে এবং তখন ত্রাহি ত্রাহি আকার ধারণ করবে। সুবোধ বাচ্চারা কিন্তু সবার হৃদয়েই নিজেদের স্থান করে নেয়। তারাই বাবার নাম উজ্জ্বল করে। পাণ্ডব সেনাতেও কেউ কেউ মহারথী হয় আবার সাধারণ সৈন্য-বাহিনীতেও কেউ কেউ মহারথী হয়। একমাত্র তোমরা বি.কে.-রাই সেই দু-ধরণের সেনাদেরকেই বুঝতে পারো। এসবই সূক্ষ্ম বোঝার বিষয়। খুব কম সংখ্যক বাচ্চাই শ্রীমৎ অনুসারে চলে থাকে। আর অন্যেরা শ্রীমৎ অনুসারে না চলার কারণে, বাবার নামও বদনাম হয়। একেই বলা হয় শ্রীমৎকে লাথি মারা। এই ব্রহ্মাকুমারীস্ সংস্থা প্রকৃত সত্য অর্থাৎ সৎ-সঙ্গের সংস্থা। এখানে বাচ্চারা একে অপরকে এমন ভাবে নিজের মতন করে গড়ে তোলে, যাতে তারাও স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী হয়ে উঠতে পারে। মায়া তাদের অনেককে এমন পাপ আত্মা বানায় যে, তারাও বাবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ভক্তি-মার্গে তো তোমরা সবাই বাবার প্রেমিকা স্বরূপ। বর্তমানের এই সঙ্গমযুগে তোমরা বাচ্চারা বাবাকে পিতা রূপেই

পাও। এখানে তোমরা সবাই ওনারই সন্তান। এছাড়া, তোমরা ওনার পেমিকাও বটে। অতএব, এমন পেমিককে কত বেশী করে স্মরণ করা উচিত সেইসব প্রেমিকাদের। ... আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা নমন জানাচ্ছেন ওঁনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) রূপ-বসন্তের মতন যেন মুখ থেকে অনবরত জ্ঞান-রত্নই বেরোতে থাকে। যোগের দ্বারা নিজের বুদ্ধিকে শক্তিশালী ও সুস্থ বানাতে হবে।

২) বাবার মতন সবাইকে সুখ দিয়ে সুখদাতা হতে হবে। দুঃখ দেবার কু-সংকল্প বা বিকল্প কখনই করবে না।

বরদান :- ইচ্ছারূপী মৃগতৃষ্ণার পিছনে দৌড়োবার বদলে প্রকৃত পুণ্য উপার্জন করার লক্ষ্যে "ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা"-ধারী হও

ব্যাখ্যা :- কোনও কোনও বাচ্চারা ভাবে যে, তার ভাগ্যে যদি লটারী আসে, তবে তা যজ্ঞের কাজে লাগাবে। আসলে, সেই পয়সা কিন্তু যজ্ঞের কাজে আসে না। কখনও বা নিজের ইচ্ছার কথা ভেবেই তা বলে যে, লটারী পেলে তো যজ্ঞ সেবাতেই লাগাবো। কিন্তু এখানে এখন যে কোটিপতি, সে আগামী সদা কালের জন্য কোটিপতির পদ হারাবে। ইচ্ছার পিছনে দৌড়ানোর অর্থ, মরীচিকায় মৃগতৃষ্ণারর পিছনে ছোটা। অতএব পুণ্য জমা করতে হলে, প্রকৃত সম্পদ (জ্ঞান) অর্জন করো। জাগতিক ইচ্ছা থেকে "ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা"-ধারী হও।

স্লোগান :- বিঘ্নকে বিঘ্ন না ভেবে, তাকে খেলা ভেবে চলতে পারলে, সেই খেলায় হাসতে-গাইতে বিঘ্নকে অতিক্রম করতে পারবে।